# নাস্তিকতার অবদান ও পরিসীমা

জয়ন্তানুজ বন্দোপাধ্যায়*

*অধিজাগতিক অলীক দর্শন থেকে মানুষের ভ্রান্ত চেতনাকে বস্তুজগত এবং মানব জীবনের দিকে ফিরিয়ে আনা মানুষের ইতিহাসে নাস্তিকতাবাদের অমূল্য অবদান। এ অবদানের বিশেষ প্রয়োজন ছিলো এবং আছে। কারণ এখানেই আছে মহাবিশ্ব এবং মানব সমাজ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক চেতনার জন্মভুমি। ধর্মের কল্পলোক থেকে মর্ত্যলোকে দৃষ্টি ফিরে এলেই মানুষের ইতিহাস চেতনা এবং আত্মশক্তির উন্মেষ ঘটে। কিন্তু শুধুমাত্র নাস্তিকতা পৃথিবী এবং মানব সমাজকে নূতন করে গড়বার পক্ষে যথেষ্ট নয়। ইতিহাস এই সাক্ষ্যই বহন করে।...*

নাস্তিকতা প্রায় সংগঠিত ধর্মের মতোই প্রাচীন। খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর গ্রিসে মহাকবি হোমার তার ইলিয়াড এবং ওডিসি মহাকাব্যে দেবদেবীদের চারিত্রিক দোষগুলো এমনভাবে দেখিয়েছেন যে প্লেটো সহ পরবর্তী অনেক গ্রীক দার্শনিক তাকে নাস্তিক রূপেই চিহ্নিত করেছেন। অন্যান্য যেসব প্রাচীন গ্রিক সাহিত্যিকের লেখায় নাস্তিকতার সুস্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যায় তাদের মধ্যে আছেন ইসকাইলাস (খ্রিষ্টপূর্ব ৫২৫-৫৪৬) এবং ইউরিপাইডিস (খ্রিষ্টপূর্ব ৪৮৫-৪০৬)। এদের দুজনেরই সাহিত্যকৃতি, বিশেষত নাট্যসাহিত্য ছিলো দেবদেবীদের সম্বন্ধ্যে ব্যাংগাত্মক রচনায় সমৃদ্ধ। যেসব প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকদের নাস্তিক বলা যায় তাদের মধ্যে আছেন হেরাক্লিটাস (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৩৫-৪৭৫), অ্যানাকসাগোরাস (খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০-৪২৮), এমপেডোক্লিস (খ্রিষ্টপূর্ব ৪৯৫-৪৩৫), প্রোটাগোরাস (খ্রিষ্টপূর্ব ৪৮৫-৪২০), ডেমোক্রিটাস (খ্রিষ্টপূর্ব ৪৬০-৩৭০) এবং এপিকিউরাস (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৪১-২৭০)। বস্তুবাদী হেরাক্লিটাস ছিলেন দ্বন্দ্বতত্তের (dialeatics) প্রথম প্রবক্তা। তার বক্তব্য ছিলো যে মহাবিশ্বের আদি এবং মূল উপাদান হচ্ছে অগ্নি। বিশ্বভুবনে সবকিছুই প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তনশীল এবং সর্ব্যাপী দুই বিপরীতমুখী প্রবণতার দ্বন্দ্ব দ্বারা চিহ্নিত। অ্যানাকসাগোরাস বলতেন যে বস্তুকণার বিভিন্ন সমাহার বা কম্বিনেশনেই মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে, যদিও তিনি মনে করতেন যে এই সমাহারকর্মের পেছনে একটি মহাবিশ্বমন (nous) আছে। প্রচলিত গ্রিকধর্মের সূর্যদেবতার বিরোধিতা করে তিনি বলেছিলেন যে সূর্য কোন দেবতা নয়, একটি বিশাল অগ্নিপিন্ড মাত্র। এমপেডোক্লিসের মতে ক্ষিতি, অব, তেজ, মরুৎ এই চার পদার্থের কণা থেকেই মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে। প্রোটাগোরাস বলেছিলেন যে দেবতাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি সম্পর্ন নেতিবাচক উত্তর দিতে সক্ষম। ডেমোক্রিটাস বলতেন যে সতত চলমান, অদৃশ্য, অভিবাজ্য এবং ধ্বংসহীন বস্তুর পরমানু থেকেই মহাবিশ্বের উদ্ভব হয়েছে। এপিকিউরাস দেবদেবীদের অস্তিত্ব অস্বীকার করতেন, এবং জাগতিক জীবনে ভোগসুখের প্রবক্তা ছিলেন। রোমক সাম্রাজ্যেও কবি কুইনটাস ইনিয়াস (খ্রিষ্টপূর্ব ২৪০-১৬৯), নাট্যকার টাইটাস প্লটাস (খ্রিষ্টপূর্ব ২৫৪-১৮৪), এবং কবি ও দার্শনিক টাইটাস লুক্রেশিয়াস ক্যারাস (খ্রিষ্টপূর্ব ৯৯-৫৫) প্রভৃতি কয়েক বিশিষ্ট চিন্তাবিদের রচনায় নাস্তিকতার উল্লেখযোগ্য প্রকাশ ঘটেছিল।

প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্ম নিরীশ্বরবাদী হলেও সেগুলো ধর্মই ছিলো। বিশেষত এই দুই ধর্মেই আত্মা ও পুনর্জন্মে বিশ্বাস হিন্দু ধর্মের মতোই প্রবল ছিলো। অতএব এদের নাস্তিকতাবাদের

সঠিক উদাহরন বলা যায় না। সাংখ্য এবং ন্যায়-বৈশেশিখ দর্শনে বস্তুবাদ বর্তমান থাকলেও তার সংগে এক ধরনের ধর্মতত্ত্ব জড়িয়ে ছিলো। আত্মা-পরমাত্মা, অদৃষ্ট, পুনর্জন্ম, কর্মফল এবং চাতুর্বর্ণ্যে এরাও বিশ্বাস করতো। অতএব এসব দর্শনকে ঠিক  সরাসরি নাস্তিক দর্শন বলা যায় না। মীমাংশাদর্শনের অনুসারিরা বৈদিক ধর্মের মতো আকাশের গ্রহ তারাদের দেবতা বলতে অস্বীকার করেছিলো। তারা বলেছিলো, জ্যোতিষ্কেরা উজ্জ্বল বস্তুপিন্ড এবং অচেতন জড় পদার্থ মাত্র, দেবতা নয়। এই অকাট্য যুক্তির উত্তরে বাদরায়ণ তার ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থে বলেছেন যে সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি প্রত্যেকটি জ্যোতিষ্কের মধ্যে সে নামের একজন দেবতা বাস করেন, যাদের শরীর, বুদ্ধি, এবং ইচ্ছাশক্তি আছে। শংকরাচার্যও বাদরায়ণের এই মতকে সমর্থন করেছেন (১)। অতএব জৈমিনীর পূর্বমীমাংশা দর্শনে নাস্তিকতার স্পষ্ট চিহ্ন বর্তমান ছিলো। কিন্তু ষড়দর্শন গড়ে উঠবার আগে থেকেই কয়েকজন অসাধারণ তাত্ত্বিক নেতা কোন না কোন ধরনের নাস্তিকতার প্রবক্তা ছিলেন। এদের মধ্যে বেলত্থ উপজাতির সঞ্জয়, পূরন কশ্যপ, কাত্যায়ন, আজীবিক সম্প্রদায়ের প্রধান মাকখালি গোশাল প্রভৃতি কয়েকজন বৈদিক ধর্মের বিরোধী হলেও এক ধরনের জগৎবিমুখ সন্ন্যাসবাদের প্রবক্তা ছিলেন। একমাত্র বৃহস্পতি-চার্বাকের নামে প্রচলিত লোকায়ত দর্শনকেই সত্যিকারের নাস্তিকতাবাদী দর্শন বলা যায়। বৃহস্পতি অথবা চার্বাক ঐতিহাসিক মানুষ ছিলেন কি না, ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব হয়ে থাকলে তারা দুজন ভিন্ন মানুষ না একই লোক, এসব নিয়ে মতবিরোধ আছে। আমরা এখানে সে আলোচনায় না গিয়ে এই প্রাচীন ভারতীয় লোকায়তবাদকে চার্বাকবাদ বলে অভিহিত করবো। আর নাস্তিকতাবাদের অবদান ও পরিসীমার অন্যতম প্রধান উদাহরন হিসেবে চার্বাকবাদের কিছুটা পর্যালোচনা করবো। কারণ ঈশ্বরে বিশ্বাস, ধর্মগ্রন্থ, ধর্মীয় ক্রিয়াকান্ড, পুরোহিত শ্রেনী এবং প্রচলিত আর্থসামাজিক কাঠামোর উপর এতো সরাসরি বলিষ্ঠ আঘাত ইতিহাসে আর কোন নাস্তিকতাবাদী সমাজ দর্শন করতে পেরেছে বলে আমাদের জানা নেই। দ্বিতীয়ত, চার্বাকবাদ এক অত্যন্ত জীবন ও জগৎ মুখী সমাজ দর্শন, যা মানব সভ্যতার বিকাশের অনুকূল। তৃতীয়ত, চার্বাকবাদের মূল বক্তব্যগুলো বিজ্ঞানসম্মত, এবং বর্তমানকালেও সাধারণ ভাবে গ্রহণযোগ্য।

চার্বাকবাদের মূল দার্শনিক বক্তব্য ছিলো দেহের সংগে চৈতন্য এবং আত্মার সম্পর্ক বিষয়ে। আর এই মূল বক্তব্যকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিলো তার সমাজ দর্শন। কিন্তু চার্বাকবাদের কোন মূল গ্রন্থ পাওয়া যায় নি। মনে হয় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরভ্যুত্থানের সময় রাজন্য শ্রেনী এবং পুরোহিত শ্রেনীর যৌথ উদ্যোগে সেগুলো ধ্বংস করে ফেলা হয়। চার্বাক বিরোধীদের বিভিন্ন ভাষ্যের পরোক্ষ সূত্র থেকেই বর্তমানে চার্বাকবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। মূল চার্বাকবাদের অসূয়াশূন্য ভাষ্য যে অল্পকয়েকজনের রচনায় পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে শংকরাচার্যই শ্রেষ্ঠ। শংকর বলেছেন : " যে লোকায়তরা শুধুমাত্র দেহের মধ্যে আত্মা দর্শন করে, তারা মনে করে যে দেহের অতিরিক্ত কোন আত্মা নেই। তারা বলে যে পৃথিবীর কোন বাহ্যিক বস্তুর মধ্যে যদিও চৈতন্য নেই, তথাপি বিভিন্ন বস্তু উপাদানের বিশেষ সংযোগে শরীর সৃষ্টি হলে তার মধ্যে মদশক্তির মতো চৈতন্যের জন্ম হয়। চৈতন্যবিশিষ্ট শরীরই পুরুষ। দেহের অতিরিক্ত এমন কোন আত্মা নেই যা নাকি স্বর্গ কিংবা নরকে যেতে পারে। যেহেতু শুধুমাত্র দেহেই চৈতন্য বর্তমান, অতএব একমাত্র দেহই চেতনাত্মা। .....আমরা যদি জানি যে কোন বস্তু যেখানে থাকে সেখানে অন্য একটি বস্তুও থাকে, আর যেখানে প্রথমোক্ত বস্তুটি থাকে না সেখানে অন্য বস্তুটিও থাকে না, তবে আমরা বুঝতে পারি যে দ্বিতীয় বস্তুটি প্রথম বস্তুটির একটি গুন মাত্র। যেমন অগ্নির সংগে উষ্ণতা এবং আলোর সহাবস্থান দেখে আমরা উষ্ণতা এবং অগ্নিকে আলোর গুন বলে থাকি। স্বতন্ত্র আত্মার সমর্থকেরা প্রাণ, কর্মপ্রচেষ্টা, চৈতন্য, স্মৃতিশক্তি প্রভৃতি যেসব আত্মার গুন বলে থাকে, তাও প্রকৃতপক্ষে শরীরের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়, শরীরের বাইরে নয়। যেহেতু শরীরের বাইরে এসবের কোন অস্তিত্বের কোন প্রমান নেই, অতএব এরা শরীরের গুন মাত্র। অতএব  শরীর থেকে আলাদা কোন আত্মা নেই "(২)। প্রত্যক্ষ প্রমানের উপর চার্বাকবাদের গুরোত্ব আরোপকে ব্যাখ্যা করে সপ্তম শতাব্দীতে চার্বাকবাদী পুরন্দর বলেছিলেন যে অনুমান

কখনো কখনো প্রমান হিসেবে গৃহীত হতে পারে, যদি তা অলৌকিকত্বকে পরিহার করে বস্তুজগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। অনেকগুলো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সঠিক অনুমান সম্ভব হতে পারে, কিন্তু এই অনুমান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে অতিক্রম করতে পারে না(৩)। নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট (অষ্টম-নবম শতাব্দী) পুরন্দরের এই যুক্তির উদাহরন রূপে বলেছেন যে নারিকেন দ্বীপের অধিবাসীরা আগুন জ্বালাতে পারে না বলে তাদের পক্ষে ধূম থেকে অগ্নির অনুমান করা সম্ভব নয় (৪)।

দেহ, আত্মা, চৈতন্য এবং প্রমান সংক্রান্ত চার্বাকবাদী দার্শনিক তত্ত্বকে ভিত্তি করে যে সমাজদর্শন গড়ে উঠেছিলো, তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাওয়া যায় হরিভদ্রসূরির (অষ্টম শতাব্দী) ষড়দর্শনসমুচ্চয় এবং মাধবাচার্যের (চতুর্দশ শতাব্দী) সর্বদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থে। এই দুই গ্রন্থে বর্ণিত চার্বাকবাদী সমাজ দর্শনের সারমর্ম এরকম। দেবতা, মোক্ষ, আত্মা, পরলোক, স্বর্গ-নরক এসব কিছুই নেই। ধর্মাধর্ম এবং পাপপুণ্যের ফলও নেই। সমস্ত বিশ্বজগৎ শুধুমাত্র ইন্দ্রয়গোচর। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এই চার বস্তু উপাদানের জমিতেই চৈতন্যের জন্ম হয়েছে, এবং একমাত্র এরই প্রত্যক্ষ প্রমান আছে। ক্ষিতি প্রভৃতি বস্তু উপাদানের সমাহারেই দেহাদির সৃষ্টি হয়েছে। যেমন বিভিন্ন বস্তুর সমাহারে মদ্যে মাদকশক্তি সৃষ্টি হয়, তেমনি বিভিন্ন জড়বস্তুর সমহারে দেহে চৈতন্যের আবির্ভাব হয়। অতএব দৃষ্ট বস্তুকে পরিত্যাগ করে অদৃষ্ট বিষয়ের প্রবর্তনা মানুষের মূঢ়ত্বের পরিচয় মাত্র। তপস্যাদির মাধ্যমে স্বর্গসুখ লাভ বা নরক যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাবার বাসনা আকাশের মতোই শূন্য। পৃথিবীর সুখদুঃখের বাইরে আর কোন স্বর্গ-নরক নেই। মৃত্যুর পরে আর কিছুই নেই। ভস্মীভূত দেহ আবার ফিরে আসবে কোথা থেকে? অতএব যতোদিন জীবন আছে, সুখেই বেঁচে থাকা উচিত। পৃথিবীতে দুঃখ আছে বলে সুখকেও পরিত্যাগ করা মূর্খতা মাত্র। সরু সাদা চালের সংগে তুষ এবং ধুলো মেশানো থাকে বলে কোন মূর্খ সে চাল ফেলে দেয়? বর্ণাশ্রমাদির ক্রিয়াও নিস্ফলা। যজ্ঞ, তিন বেদ, ত্রিদন্ড এবং ভস্মলেপন বুদ্ধি ও পৌরষহীন মানুষদের জীবিকার উপায় মাত্র। মৃত লোকদের শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ক্রিয়া নিজেদের জীবিকার উপায় হিসেবে ব্রাহ্মণদের দ্বারা রচিত বিধান ছাড়া আর কিছুই নয়। তিন বেদের রচিয়তারা ধূর্ত, ভন্ড এবং নিশাচর। পন্ডিতদের উচ্চারিত জর্ফরী-তর্ফরী ইত্যাদি মন্ত্র (অশ্বমেধ যজ্ঞে ঋগ্বেদীয় মন্ত্র বিশেষ) অর্থহীন হাজর-বাজর মাত্র।

আধুনিক যুগের পটভুমিতে চার্বাকবাদের সবচেয়ে বড়ো অবদান সম্ভবত মানব জীবনের প্রতি এর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী। আমরা সকলেই বর্তমানে জানি যে বস্তু ছাড়া চৈতন্য নেই, দেহ ছাড়া আত্মা নেই, স্বর্গ-নরক পরলোক নেই এসব বক্তব্য সম্পুর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ও সৃষ্টিবিজ্ঞান এই সন্দেহাতীত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে মহাবিশ্বে বস্তুর বিস্ফোরন, বিবর্তন, বিকিরন, এবং বস্তুকনার বিশেষ সমাহার থেকেই কালে চৈতন্যের জন্ম হয়েছে। বস্তুহীন কোন চৈতন্য কিংবা আত্মা মহাকাশে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নি। দেহের অভ্যন্তরে মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রিত স্নায়ুতন্ত্র ছাড়া কোন বিদেহী আত্মা নেই। নেই হৃৎপিন্ডের মধ্যে অংগুষ্ঠ প্রমান পুরুষ রূপে, কিংবা অন্যকোন রূপে দেহের অন্য কোথাও। আত্মা সূক্ষ্ম বা অদৃশ্য বলেই বিজ্ঞান তার অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে পারে নি, এ ভাবনা অমূলক। কারণ আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এবং অদৃশ্য অনেক বস্তুকনা বা তরংগ, বা মহাকাশে অদৃশ্য বিশাল কৃষ্ণবিবরের (black hole) অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে পেরেছে। কিন্তু মহাকাশে কিংবা প্রাণীদেহে বিদেহী আত্মা বা চৈতন্যের সন্ধান পাওয়া যায় নি। এদিক থেকে বিচার করলে সমকালের পটভূমিতে চার্বাকবাদের বক্তব্য ছিলো অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিকতায় সমৃদ্ধ।

তাছাড়া চার্বাকবাদ আর্থসামাজিক সাম্যকে, অতএব মানবাতাবাদকে, জোরালো ভাবে সমর্থন করেছিলো। এই সমাজ দর্শনে চাতুর্বর্ণ্যের বিরোধিতা করেছিলো। আর এটাই ছিলো অন্য সব বেদভিত্তিক, অতএব চাতুর্বর্ণ্য সমর্থক অন্যান্য সমকালীন দর্শনের ঘোরতর চার্বাক বিরোধিতার কারণ। সমকালীন

ব্রাহ্মণ্যধর্মের আর্থসামাজিক কাঠামো চাতুর্বর্ণ্য প্রথার উপর দাড়িয়ে ছিলো, এবং ব্রাহ্মণ-পুরোহিত ও ক্ষত্রিয় সহ সমস্ত শাষকশ্রেনীর স্বার্থই ছিলো এই প্রথার সুরক্ষার উপর নির্ভরশীল। আর ধর্মবিশ্বাস এবং পুরোহিত শ্রেনীর উপর প্রচন্ড আক্রমনের মাধ্যমে চার্বাকবাদ এই শ্রেনীস্বার্থকেই সংকটাপন্ন করে তুলেছিলো। অন্তত একশ্রেনীর চার্বাকবাদী বলতো যে পৃথিবীতে মাত্র দুটি জাতি আছেঃ স্ত্রী জাতি এবং পুরুষ জাতি। এ ছাড়া মনুষ্য সমাজে আর কোন জাতি নেই (৫)। এ প্রসংগে বলা প্রয়োজন যে চার্বাকবাদ নারীমুক্তির ও পথপ্রদর্শক ছিলো। যে দেশে নারী চিরকাল ধর্মের শাষনে সারা পরিবারের দাসীবৃত্তি করেছে, আর পুরুষদের পেট ভরিয়ে নিজে অভুক্ত-অর্ধভক্ত থেকেছে, সে দেশে চার্বাকবাদ অসীম সাহসিকতায় নারীকে সাম্য ও সম্মানের আসনে বসিয়ে নিঃসংকোচে বলেছে : '' হে চারুলোচনে, পান করো আর খাও। হে সুন্দরী, যা অতীত হয়ে গেছে তা আর তোমার নয়। হে ভীরু, এই শরীর একবার শেষ হলে আর কখনো ফিরে আসে না ''(৬)। শ্রী হর্ষ রচিত নৈষধীয়চরিত কাব্যে নারীমুক্তি সম্বন্ধে চার্বাকীয় দৃষ্টিভংগীর যে উল্লেখ আছে, তা থেকেও এ বিষয়ে চার্বাকবাদের প্রগতিশীল ভূমিকার পরিচয় পাওয়া যায়। এতে এক জায়গায় বৃহস্পতি শাস্ত্রকার ব্রাহ্মণদের বলেছেন ঃ'' কামাসক্তির দিকথেকে নারী-পুরুষ পার্থক্য না থাকা সত্ত্বেও যারা ঈর্ষাবশত নারীদের ঘরে বন্ধ রাখে, অথচ পুরুষদের বন্ধ রাখে না, সে দাম্ভিক কুলমর্যাদাবাদীদের ধিক। .....নারীদের সম্বন্ধে ঘৃনাসূচক কথাবার্তা তৃণের মতো ত্যাগ করো। তুমিও তো তাদেরি মতো, তবে কেন চিরকাল মানুষকে বঞ্চনা করছো '' (৭)।

ধনী ও দরিদ্র সম্পর্কে বিষয়ে চার্বাকবাদী সমাজ দর্শনের গভীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে হরিভদ্রসূরি রচত ষড়দর্শনসমুচ্চয় গ্রন্থের টীকাকার মনিভদ্রসূরি বলেছেন যে কোনটা বাস্তব আর কোনটা অবাস্তব তা প্রমানের জন্য যদি একমাত্র প্রত্যক্ষকেই গ্রহন করা হয়, তবে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বাস্তবতাকে অস্বীকার করবার উপায় থাকবে না। তখন দরিদ্র মানুষ ''স্বর্ণরাশি আমার'' এই ধারণা করে নিজ দারিদ্রকে হেলায় দলন করবে। দাসও প্রভুত্বের ভাব অবলম্বন করে নিজ দাসত্বকে ধ্বংস করবে। কোন লোকই আর অনভিপ্রেত জীবিকা মেনে নেবে না। এভাবে সেব্য-সেবক এবংধনী-দরিদ্র পার্থক্য মুছে যাবে।আর প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা বিলোপের দাবি উঠবে। এই আশংকা থেকেই অনুমানের দ্বারা প্রমানের পক্ষপাতী ধর্মের ছদ্মবেশধারী পরবঞ্চনাপ্রবণ ধূর্তেরা (ধর্মচ্ছদ্মধূর্তাঃ পরবঞ্চনাপ্রবণাঃ) মানুষকে স্বর্গাদি প্রাপ্তি থেকে লভ্য ভোগাভোগের লোভ দেখিয়ে তাদের মধ্যে মুগ্ধ ধর্মান্ধতা উৎপাদন করে থাকে (মুগ্ধধার্মিকান্ধ্যং চোৎপাদয়ন্তি) (৮)।

চার্বাকবাদের দৃষ্টিভংগী মানবজীবন ও মানবসভত্যা সম্বন্ধে ইতিবাচক। যে ধরনের জগৎ ও জীবনমুখী সমাজ দর্শন ইতিহাসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশে ত্বরান্বিত করেছে, যার মাধ্যমে ইতিহাসে মানুষের অনিরাপত্তা এবং অমংগল কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে, চার্বাকবাদে সে ধরনের বস্তুবাদী সমাজ দর্শনের প্রায় সব উপাদানই আছে। চার্বাকবাদ মানুষকে বলেছে মানব জীবন, পৃথিবী ও মহাবিশ্বকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী দিয়ে দেখতে। ধর্মমোহ ত্যাগ করতে। পরলোক এবং অদৃষ্টের কল্পনা বর্জন করতে। পৃথিবী এবং মানবজীবনকে মায়াময়, মোহময়, দুঃখময় এবং বন্ধনের কারণ রূপে গন্য না করতে। বস্তুজগৎকে মিথ্যা জ্ঞান না করতে। মানুষের পার্থিব জীবনকে অনেক অমংগলের মধ্যেও ভোগসুখে আনন্দময় করে তুলতে। চার্বাকবাদী সমাজদর্শনে এমন কি সাম্যের আদর্শের ইতিবাচক লক্ষণও আছে, যেখানে নারী-পুরুষ অসাম্য, ধনী-দরিদ্র অসাম্য, সেব্য-সেবক অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ব্যঞ্জনা সুস্পষ্ট। এসব দিক থেকে চার্বাকপন্থী নাস্তিকতাবাদ আধুনিক বিজ্ঞান, বস্তুবাদ, পজিটিভিজম বা দৃষ্টিবাদ, যুক্তিবাদ এবং মানবতাবাদের সমর্থন দাবি করতে পারে।

কিন্তু এতো সব ইতিবাচক গুণ থাকা সত্ত্বেও চার্বাকবাদের কিছু অনস্বীকার্য সীমাবদ্ধতা আছে।

আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে মানবতা এবং সাম্যের আদর্শ প্রচ্ছন্ন ভাবে বর্তমান থাকলেও এই সমাজ দর্শনে কোন মানবতাবাদী রাজনৈতিক চিন্তার সুস্পষ্ট পরিচয় নেই। মাধবাচার্য রচিত সর্বদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থের একটি চার্বাকবাদী শ্লোক অনুযায়ী পৃথিবীতে স্বীকৃত রাজার উপরে আর কোন পরমেশ্বর নেই (লোকসিদ্ধ ভবেদ্রাজা পরেশো নাপরঃ স্মৃতঃ)। এ থেকে মনে স্বাভাবিক যে চার্বাকবাদীরা নিরংকুশ রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন। অবশ্য একটি মাত্র লাইন থেকে এ সিদ্ধান্তে আসা সম্পুর্ন যুক্তিসম্মত নয়। তাছাড়া পুরোহিত শ্রেনী, চাতুর্বর্ণ্য, ধর্মগ্রন্থ, ধর্মীয় ক্রিয়াকান্ড এবং পরলোকতত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যে নিরংকুশ রাজতন্ত্রের মধ্যে ফলপ্রসূ হবার কোনও সম্ভবনা ছিলো না, চার্বাকবাদের তাত্ত্বিক নেতাদের মতো ধীশক্তিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে তা উপলব্ধি করাই ছিলো স্বাভাবিক। তথাপি এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে চার্বাকবাদের মধ্যে কোন ভবিষ্যতমুখী রাজনৈতিক চিন্তার সুস্পষ্ট প্রমান নেই। সক্রেটিস (খ্রিষ্টপূর্ব ৪৬৯-৩৯৯), প্লেটো (খ্রিষ্টপূর্ব ৪২৭-৩৪৭), অ্যারিস্টটল (খ্রিষ্ট পূর্ব ৩৮৪-৩২২) প্রভৃতি সমকালীন গ্রিক চিন্তকদের রচনায়, তথা প্রাচীন গ্রিক ও রোমক সভ্যতায় গণতান্ত্রিক চিন্তার বিকাশের যে পরিচয় পাওয়া যায় (যদিও সে গণতন্ত্র শাষকশ্রেনীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো), চার্বাকবাদে তার উপস্থিতি লক্ষ করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে এ দেশের প্রাচীন ধর্মসুত্র এবং ধর্মশাস্ত্রে যে নিরংকুশ রাজতন্ত্রের সমর্থন আছে, সে রাজতন্ত্রের দৈব উৎপত্তির তত্ত্ব বর্জন করলেও রাজতন্ত্রকে বর্জন করে সমাজের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কোন চিন্তা চার্বাকবাদে ছিলো বলে মনে হয় না। চার্বাকবাদের আর্থসামাজিক চিন্তা এবং রাজনৈতিক চিন্তার মধ্যে একটা স্ববিরোধ বা ব্যবধান ছিলো। অংশত এ কারণেই চার্বাকবাদ একটি পুর্ণাংগ সমাজ দর্শন হয়ে উঠতে পারে নি। আর এই রাজনৈতিক চেতনার দৈন্য বশতই চার্বাকবাদ আর্থসামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের জন্যও কোন পথনির্দেশ করতে পারে নি। এ দিক থেকেও সমকালীন গ্রিক মননশীলদের চেয়ে চার্বাকবাদীরা (এবং সাধারণ ভাবে ভারতীয় চিন্তকেরা) পিছিয়ে ছিলো। প্রাচীন গ্রিক রাষ্ট্রচিন্তায় গণবিপ্লবের সুফল-কুফল নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছিলো। কিন্তু এ সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয় মননশীলদের নীরবতা কাটিয়ে উঠে চার্বাকবাদ সোচ্চার হতে পারে নি। ফলে আর্থসামাজিক কাঠামোর বৈপ্লবিক পরিবর্তনের যে সম্ভাবনা এই সমাজ দর্শনে সুপ্ত ছিলো, তা কখনো গণশক্তিনির্ভর, সক্রিয়, গতিশীল রূপ ধারণ করতে পারে নি। দ্বিতীয়ত, চার্বাকবাদের জীবনমুখী ভোগবাদী সমাজদর্শনেরও কোন সামগ্রিক রুপরেখা খুঁজে পাওয়া যায় না। নৃত্যগীতের প্রতি চার্বাকবাদীদের অনুরাগের পরিচয় আছে। সে দিক থেকে মনে করা যেতে পারে যে তাদের মধ্যে নান্দনিক উপলব্ধি বা সৌন্দর্যবোধের অভাব ছিলো না। কিন্তু প্রাচীন গ্রিসে এপিকিউরাসের (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৪১-২৭০) নাস্তিক চিন্তায় যেমন সীমিত জাগতিক ভোগের উপর প্রতিষ্টিত বৌদ্ধিক জীবনকে মানুষের আদর্শ হিসেবে ঘোষনা করে ভোগবাদের সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছিলো, জীবন দর্শনের সেরকম কোন স্পষ্ট রূপরেখা চার্বাকবাদে পাওয়া যায় না। তাই চাতুর্বর্ণ্য ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের রক্ষায় শাষকশ্রেনী ও রাষ্ট্রশক্তির সংঘবদ্ধ আক্রমনে চার্বাকবাদ যখন পর্যদুস্ত হলো, তখন এক অস্পষ্ট ভোগবাদী বক্তব্য ছাড়া এই সমাজ দর্শনের আর কিছুই অবশিষ্ট রইলো না। পরবর্তী কালে চার্বাকবাদীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিভিক্ত হয়ে কাপালিক, সহজিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সংগে মিশে গিয়ে শুধু মাত্র পঞ্চমাকার উপভোগ করবার জন্যই প্রসিদ্ধ হয়ে রইলো। আধুনিক সভ্যতায়ও সীমাহীন, নৈতিক আদর্শহীন, ব্যক্তিগত ভোগবাদের সংকট ও অবক্ষয় ইতিমধ্যে চিন্তাশীল মানুষের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। জীবনমুখী সমাজ দর্শন সভ্যতাবিকাশের অনুকূল। কিন্তু মানব সমাজে সাম্য ও স্বাধীনতা ভিত্তিক জাগতিক কাঠামোর অভ্যন্তরে জ্ঞানবিজ্ঞান এবং বৌদ্ধিক ও নান্দনিক প্রগতি ব্যক্তি জীবনের আদর্শ রূপে প্রতিষ্টিত না হলে সে সমাজ দর্শন পূর্ণাঙ্গ রূপ নিতে পারে না।

ইউরোপে রেনেসাঁস এবং রেফরমেশনের ফলশ্রুতি হিসেবে যে বৌদ্ধিক নবজাগরন এবং সাংকৃতিক পরিবর্তন আরম্ভ হয়, তার ফলে একাধারে বিজ্ঞানের নবদিগন্ত উন্মোচিত হয় এবং দর্শনচিন্তায়ও জগৎ ও জীবনমুখিতা দেখা দেয়। কোপারনিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩), গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২), কেপলার

(১৫৭১-১৬৩০), উইলিয়াম হারভে (১৫৭৮-১৬৫৭) এবং নিউটন (১৬৪২-১৭২৭) যে বৈজ্ঞানিক প্রবাহের সৃষ্টি করেন, তার মধ্যে নাস্তিকতাবাদের সম্ভবনা সুপ্ত ছিলো, কারণ তা খ্রিষ্ট ধর্মের অনেক মৌলিক বিশ্বাসের মূলেই আঘাত হেনেছিলো। আধুনিক বিজ্ঞানমনস্কতার এই প্রবাহের সংগে সংগে দর্শনেও জগৎমুখী চিন্তাভাবনা আরম্ভ হয়। ইংল্যান্ডে রজার বেকন (১২১৪-১২৯৪), টমাস হবস (১৫৮৮-১৬৭৯), জন লক (১৬৩২-১৭০৪)ও ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬), ফ্রান্সে দেকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০) এর চিন্তাধারায় বস্তুবাদ এবং প্রয়োগবাদ (empiricism) আত্মপ্রকাশ করেছিলো। কিন্তু এরা কেউই সরাসরি ধর্মবিশ্বাসের বা ঈশ্বরতত্ত্বের বিরোধিতা করেন নি। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে ডাচ দার্শনিক স্পিনোজা (১৬৩২-১৬৭৭) এক ধরনের প্রাকৃতিক অদ্বৈতবাদ সৃষ্টি করে বস্তুবাদ ও নাস্তিকতার সম্ভবনাকে উজ্জ্বল করেছিলেন। কিন্তু ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর এই বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক বিপ্লবে পরবর্তীকালের নাস্তিকতাবাদের বীজ সুপ্ত ছিলো। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সে বীজ অংকুরিত হয়।

প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সে জ্ঞানবাদী আন্দোলনের (Enlightenment) তাত্ত্বিক নেতাদের দ্বারা ধর্মবিশ্বাস এবং প্রাতিষ্টানিক ধর্মের তীব্র বিরোধিতার মধ্যেই আধুনিক বস্তুবাদ এবং নাস্তিকতার উৎস খুঁজে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ভলতেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮), দিদেরো (১৭১৩-১৭৮৪), লা মেতরি (১৭০৯-১৭৫১), হেলভেশিয়াস (১৭১৫-১৭৭১), কনডিলাক (১৭১৫-১৭৮০), এবং হলবাক (১৭২৩-১৭৮৯)। ভলতেয়ার প্রথম দিকে ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং ধর্মের পুরোপুরি বিরোধী ছিলেন না। পুরোহিত শ্রেনী এবং রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ক্রমশ তিনি তীব্র ধর্মবিরোধী হয়ে উঠেন, বহু সংখ্যক প্রচার পুস্তিকার মাধ্যমে ধর্মবিরোধী প্রচারে অগ্রনী ভুমিকা পালন করেন, এবং তার সমসাময়িক বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে ধর্মের প্রতি সহনশীলতার মনোভাবের নিন্দা করেন। পুরোহিত শ্রেনী ও রোমান ক্যাথলিক চার্চকে লক্ষ করে তাঁর বিখ্যাত স্লোগান ছিলো, '' এই কুখ্যাত বস্তুটাকে গুড়িয়ে দাও '' (Ecrasez I' infame!)। অনেকে মনে করেন যে সংগঠিত ধর্মের, বিশেষত রোমান ক্যাথলিক ধর্মের তীব্র বিরোধিতা করলেও ভলতেয়ার পুরোপুরি নাস্তিক ছিলেন না। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে ভলতেয়ার প্রভাব মূলত অষ্টাদশ শতাব্দীর জ্ঞানবাদী আন্দোলনে নাস্তিকতাকেই সমৃদ্ধ করেছে। ডেনিস দিদেরো অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসে (মানব সভ্যতার ইতিহাসে) বিখ্যাত হয়েছেন জ্ঞানবাদী আন্দোলনের সে সুপন্ডিত এবং অসীম সাহসী নেতা হিসেবে, যিনি পোপ তৃতীয় ক্লেমেন্ট এবং রাষ্ট্রের প্রবল বাধা অতিক্রম করে ষোল খন্ডে পৃথিবীর প্রথম বিশ্বকোষ বা এনসাইক্লোপিডিয়ার সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। তিনি ও প্রথম জীবনে ভলতেয়ারের মতো এক ধরনের জগৎমুখী ব্যক্তিগত ধর্মের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করতেন। কিন্তু ক্রমশ তার চিন্তাধারার রুপান্তর ঘটে এবং তিনি বুঝতে পারেন যে ধর্মের প্রতি যে কোন সহানুভূতি প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের সংগে আপোষেরই নামান্তর। কিন্তু শেষ পর্যন্তও তিনি ব্যক্তিমানুষের বিবেক, চৈতন্য ও অস্তিত্ব বিরহ নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। এ কারণে এখন অনেকে তাঁকে অস্তিত্ববাদী (Existentialist) আখ্যা দিয়ে থাকেন।

উপরে আর যে কজন নাস্তিকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তারা সকলেই ছিলেন ধর্মের প্রতি আরো অনেক বেশী অসহিষ্ণু, এবং ধর্মবিশ্বাসের উপর প্রত্যক্ষ আঘাত হানবার পক্ষপাতী। লা মেতরি তার প্রসিদ্ধ Man A Machine (১৭৪৮) গ্রন্থে দেহ থেকে আলাদা কোন আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করে এক সম্পুর্ণ বস্তুবাদী এবং নাস্তিকতাবাদী জীবন দর্শনের প্রবক্তা রূপে পরিচিত হন। Discourse on Happiness (১৭৫০) শীর্ষক আরেকখানি গ্রন্থে তিনি চার্বাক ও এপিকিউরাসের সমাজ দর্শনের সংগে তুলনীয় এক নাস্তিকতা ভিত্তিক এবং ভোগবাদী জীবন দর্শন গড়ে তুলেন। হেলভিশিয়াস তার On the Mind (তার মৃত্যুর পরে ১৭৭২ সালে প্রকাশিত) গ্রন্থে পুরোপুরি বস্তুবাদ ও নাস্তিকতাবাদের প্রবর্তন

করেন। তিনি বলেন যে মানুষের মন বস্তুজগৎ এবং প্রাকৃতিক ও জাগতিক পরিবেশ দ্বারাই গঠিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়। ঈশ্বর কিংবা অন্য কোন অধিজাগতিক সত্তা দ্বারা নয়। সে কারণে তিনি হিতবাদী নীতিতত্ত্বেরও ( Utilitarianism ) সমর্থক ছিলেন। হালবাকও একই ভাবে বস্তুবাদী ও নাস্তিকতাবাদী সমাজ দর্শন প্রচার করেন। খ্রিষ্ট ধর্মের উপর তীব্র আক্রমন করে তিনি প্রথমে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন যার ফরাসী ভাষায় নাম ছিলো *christianisme devoile* (১৭৬১)। এই নামটিতে কিছুটা চাতুর্যের পরিচয় ছিলো। কারণ এটির অর্থ হতে পারে প্রত্যাদেশিত ( revealed) খ্রিষ্ট ধর্ম বা খ্রিষ্ট ধর্মের স্বরুপ প্রকাশিত (exposed)। হলবাক তার এই বস্তুবাদী এবং নাস্তিকতাবাদী চিন্তাধারাকে তার System of Nature (১৭৭০) নামক পরবর্তী গ্রন্থে আরও পরিবর্ধিত ও সম্প্রসারিত করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর জ্ঞানবাদী আন্দোলনের মধ্যে এভাবে যে শক্তিশালী নাস্তিকতাবাদ গড়ে উঠেছিলো, চার্বাকবাদের মতো তারও কিছু গুরতর সীমাবদ্ধতা ছিলো। প্রথমত, এই নাস্তিকতা ছিলো অভিজাত শ্রেনী বা আর্য শ্রেনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এর জীবনমুখী রূপ থাকলেও গণমুখী রূপ ছিলো না। মূলতো বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদকে ভিত্তি করে, এবং জ্ঞানের ভান্ডারকে বিস্তৃত করে, মানুষের ধর্মবিশ্বাস এবং অন্যান্য কুসংস্কার দূর করাই ছিলো জ্ঞানবাদী আন্দোলনের লক্ষ্য। লক ও রুসোর দার্শনিক-রাজনৈতিক চিন্তাধারায় যে উদারনৈতিক বা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ধ্যান-ধারণা ছিলো, এবং যা ফরাসী বিপ্লবকে প্রভাবিত করেছিলো, সেটুকু গণমুখী রাজনৈতিক চিন্তাও অধিকাংশ জ্ঞানবাদী তাত্ত্বিক নেতার ছিলো না। কোন সুদূরপ্রসারী সার্বিক গণমুক্তির আদর্শতো দূরের কথা। জ্ঞানবাদী আন্দোলনের ভিতরে যে পুরোহিত শ্রেনীর বিপুল রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং ধনসম্পত্তির বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমন ছিলো, একমাত্র সে তাত্ত্বিক বিদ্রোহই ফরাসী বিপ্লবে কিছুটা সহায়তা করেছিলো। কিন্তু জ্ঞানবাদী আন্দোলনের নাস্তিকতাবাদী তাত্ত্বিক নেতাদের চিন্তায় কোন ভবিষ্যৎমুখী এবং গণমুখী সামগ্রিক সমাজ দর্শন ছিলো না। উদাহন স্বরূপ ভলতেয়ার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চিন্তায় রক্ষনশীল ছিলেন। তিনি স্পষ্টতই গণতন্ত্রের বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি আমজনতাকে নিষ্ঠুর, সংস্কৃতিহীন এবং মূর্খ মনে করতেন। তিনি ছিলেন উদার রাজতন্ত্রের সমর্থক, এবং অভিজাত শ্রেণীর প্রবক্তা। দিদেরোর চিন্তায় প্রচ্ছন্ন গণতন্ত্রের ইংগিত ছিলো। তিনি বলেছিলেন যে আকাশের সার্বভৌম সত্তাদের ভূপাতিত করতে পারলে জনগণ শেষে পৃথিবীর সার্বভৌম শক্তিগুলোকে অস্বীকার করবে। কিন্তু তিনিও ছিলেন মূলত মুক্তচিন্তা এবং জ্ঞানবিস্তারের সমর্থক। কোন গণমুখী রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক চিন্তা তাঁর বক্তব্যে উল্লেখযোগ্য স্থান পায় নি। হেলভেশিয়াসের সংগে ভলতেয়ারের এই পার্থক্য ছিলো যে ভলতেয়ার যেখানে জনগণকে মূর্খ বলতেন, সেখানে হেলভিশয়াস বলতেন যে তারা জন্মগতভাবে মূর্খ নয়, অশিক্ষা বশত অজ্ঞ মাত্র। কিন্তু তিনিও ব্যক্তিস্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত হিতবাদী দর্শনের বেশি গণমুখী কোন ব্যাপকতর সমাজ দর্শন গড়ে তুলতে পারেন নি। তিনি বলতেন যে পদার্থ বিদ্যায় যে গতির কেন্দ্রীয় স্থান, নীতিতত্ত্বে ব্যক্তিস্বার্থের সেরূপ কেন্দ্রীয় স্থান। আর এই ব্যক্তিস্বার্থ ভিত্তিক হিতবাদের মধ্যে ব্যক্তিস্বার্থ এবং জনস্বার্থের সমন্বয় হবে শুধু আইনের মাধ্যমে। আর এজন্য প্রয়োজন একদল দক্ষ ও জ্ঞানী আইন প্রণেতা। একমাত্র এ ধরনের আইন প্রণয়নের মাধ্যমেই ব্যক্তিস্বার্থ সম্পন্ন মানুষকে অপর মানুষের স্বার্থ রক্ষা করতে বাধ্য করা সম্ভব।

অষ্টাদশ শতাব্দীর জ্ঞানবাদী আন্দোলনের বিজ্ঞান ও যুক্তি ভিত্তিক নাস্তিকতার এসব গুরুতর সীমাবদ্ধতার ফলে রুসোর চিন্তাধারা থেকে আরম্ভ করে ক্রমশ রোমান্টিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের অসফলতা এবং নেপোলিনিয়নের সামাজ্যবাদী যুদ্ধের শেষে ইউরোপে কনসার্ট অফ ইউরোপ এবং কোয়াড্রুপল অ্যালায়েনসের আওতায় যে প্রতিবিপ্লব দানা বেঁধে উঠে, তার মধ্যে একই সংগে রাজতন্ত্র এবং ধর্ম ও পুরোহিত শ্রেনীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৩০ এবং ১৮৪৮ সালের ইউরোপীয়

বিপ্লবের পরাজয়ের পর এই প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক প্রবাহ আরও শক্তিশালী হয়ে উঠে। এই ঐতিহাসিক পটভূমিতেই মার্কসবাদের জন্ম হয়, আর শ্রমিক শ্রেনীর মুক্তির আদর্শ হিসেবে মার্কসবাদ ইউরোপে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আধুনিক যুগে মার্কসবাদের মধ্যেই প্রথম ইতিহাস, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং সমাজ বিজ্ঞানের ভিত্তিতে মানব সমাজের এক সামগ্রিক আদর্শের অংগ হিসেবে নাস্তিকতাবাদ স্থান পায়। কিন্তু মার্কসবাদী নাস্তিকতায় পৌঁছোবার আগে কার্ল মার্কসের সমকালীন , অথচ তার চিন্তাধারার বিরোধী আরো দুজন দার্শনিকের ধর্মবিরোধীতার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ প্রয়োজন। এদের একজন ফ্রেডারিক নিয়েৎশে বা নিচে (১৮৪৪-১৯০০), আর অপরজন ইউজেন ডুরিংগ (১৮৩৩-১৯২১)।

দর্শন ও রাজনীতিতে নিয়েৎশে ছিলেন ক্ষমতার বাসনা বা আগ্রহ (will to power) তত্ত্বের প্রবক্তা। তার প্রধান এবং প্রসিদ্ধ Thus Spake Zarathustra গ্রন্থে তিনি ‘‘অতিমানব’’(superman) তত্ত্ব রচনা করেন। এই অতিমানবের আদর্শ উত্তর অতলান্তিক অঞ্চলের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে স্থায়ী ভাবে নীড় বেঁধে আছে। সুপার পাওয়ার বা অতিশক্তিমান রাষ্ট্রের আদর্শও নিয়েৎশের অতিমানব আদর্শেরই সম্প্রসারিত রূপমাত্র। নিয়েৎশের রাজনৈতিক দর্শন থেকে ফ্যাসিবাদও বিশেষ অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলো। তিনি মনুস্মৃতির বিশেষ গুণগ্রাহী এবং সমর্থক ছিলেন। কারণ ঐ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের বিশেষ অধিকার এবং আমজনতার হীনস্থানের সমর্থন তার কাছে আদরনীয় মনে হয়েছিলো। এভাবে রাজনৈতিক স্বৈরাচার, যুদ্ধ ও অসাম্যের প্রবক্তা রূপে তিনি ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল দার্শনিক-রাজনৈতিক প্রতিমূর্তি। কিন্তু তার চিন্তাধারার একটি গুন ছিলো যে তার ধর্মবিরোধিতা ছিলো স্পষ্ট, জোরালো এবং দ্ব্যর্থহীন। প্রকৃতপক্ষে তিনি পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম এবং ধর্মতত্ত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করেছিলেন। সব ধর্মকেই তিনি ভ্রান্ত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অযৌক্তিক, অপ্রয়োজনীয়, এবং মানব জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর বলে ঘোষনা করেছিলেন। ধর্ম মানবজীবনে দুর্বলতা, জীবনবিমুখতা, এবং শক্তিহীনতা সৃষ্টি করে মানব সভ্যতার অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে। ‘‘ ঈশ্বরের মৃত্যু ’’ ঘোষনা করে তিনি আত্মার অস্তিত্ব এবং সব রকম অধিজাগতিক সত্তা অথবা কল্পনার বাস্তবতা জোরালো ভাবে অস্বীকার করেন।

জার্মান দার্শনিক ও সমাজচিন্তক ইউজেন ডুরিংগ সম্ভবত চিন্তার ইতিহাসে কোন স্থানই পেতেন না, যদি না ফ্রেডারিক এংগেলস তার তীব্র সমালোচনা করে Anti Duhring নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থটি লিখতেন। ডুরিংগ ছিলেন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র এবং সামাজিক চুক্তি তত্ত্বের সমর্থক। হবস, লক ও রুসোর সামাজিক চুক্তি তত্ত্বের ভিত্তিতে তিনি এমন একটি ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা রচনা করেন, যেখানে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে। এখানে ব্যক্তিমানুষকে রাষ্ট্রের নিরংকুশ সার্বভৌমতার অধীন হতে হবে, কিন্তু রাষ্ট্র থাকবে জনগণের নিয়ন্ত্রনে। রাষ্ট্রের হাতে যেহেতু সৈন্যবাহিনী ও পুলিশ থাকবে, অতএব কি ভাবে প্রকৃতপক্ষে সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র জনগণের হাতে আসবে তা পরিষ্কার নয়। অতএব শেষপর্যন্ত ডুরিংগ প্রাশিয়া রাষ্ট্রের মতো স্বৈরাচারী রাষ্ট্রব্যবস্থার সমর্থক ছিলেন বলে মনে হয়। কিন্তু বর্তমান আলোচনার পক্ষে প্রাসংগিক তথ্য এই যে ডুরিংগ ছিলেন সে অল্পকজন চিন্তকদের মধ্যে একজন, যারা রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে ধর্মকে নিষিদ্ধ করবার পক্ষপাতী। তার ভবিষ্যৎ আদর্শ রাষ্ট্রের সংবিধানে ধর্ম নিষিদ্ধ হবে। কারণ :

In the free society there can be no religious worship, for every member of it has got beyond the primitive childish superstition that there are beings, behind nature or above it, who can be influenced by sacrifices or prayers. [A] Socialitarian system, rightly conceived, has therefore.....to abolish all paraphernalia of religious magic, and therewith all the essential

elements of religious worship. (৯)

রাষ্ট্রীয় জবরদস্তির মাধ্যমে এভাবে ধর্মবিলোপের প্রস্তাবের সরাসরি বিরোধিতা করেছেন ফ্রেডারিক এংগেলস, মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। এংগেলস বলেছেন যে মানুষের জাগতিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন বাহ্যিক শক্তি, বিশেষত উৎপাদন ব্যবস্থা, ব্যক্তিমানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রন করে। আর সে নিয়ন্ত্রনের অভিজ্ঞতা থেকেই মানুষ অধিজাগতিক শক্তির কল্পনা করে ধর্ম রচনা করে। যতোদিন মানুষের জাগতিক কারণগুলো বর্তমান থাকবে, ততোদিন জোর করে ধর্মকে বিলুপ্ত করা যাবে না। আর শুধু মাত্র বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিস্তারের মধ্য দিয়েও ধর্মের অবসান ঘটানো সম্ভব হবে না। কারণ ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদন সম্পর্কের নিয়ন্ত্রন শক্তিগুলোকে সে ভাবে বশে আনা যাবে না। তবে কিভাবে ধর্ম দূর হবে? এংগেলসের উত্তর, আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে। সমাজ যখন সমস্ত উৎপাদন ব্যবস্থাকে নিজে অধিগ্রহন করে নিজেকে মুক্ত করবে, তখন মানুষের অস্তিত্ব বিরহ দূর হবে, আর সেই সংগে ধর্মের প্রয়োজনীতাও ফুরিয়ে যাবে (১০)। কার্ল মার্কস আরো আগেই ধর্মের সামাজিক ভিত্তি সম্বন্ধে, এবং একদিকে জ্ঞানবাদ এবং অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় জবরদস্তির বদলে আর্থসামাজিক রূপান্তরের মাধ্যমে ধর্মের জাগতিক বুনিয়াদ বিলোপের প্রয়োজনীতা সম্বন্ধে মার্কসবাদের মূল বক্তব্য উপস্থাপিত করেছিলেন। ধর্ম এবং ধর্মের বিলোপ সম্বন্ধে মার্কসীয় বক্তব্য মার্কস এবং এংগেলসের অনেকগুলো গ্রন্থ এবং রচনাতেই পাওয়া যায়। তবে, এসবের মধ্যে " Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Law " প্রবন্ধের মুখবন্ধে এ বিষয়ে মূল বক্তব্যটি মার্কস অতি সুন্দর কাব্যময় ভাষায় উপস্থাপিত করেছেন। সেখান থেকেই নিচের কিঞ্চিত দীর্ঘ উদধৃতিটি দেয়া হলো :

The basis of religious criticism is : man makes religion, religion does not make man, religion is the self-conciousness and self-esteem of man who has either not found himself or has already lost himself again. But man is no abstract being encamped outside the world. Man is the world of man, the state, society. This state, this society, produce religion, an inverted world-consciousness, because they are an inverted world. Religion is the general theory of that world, its encyclopaedic compendium, its logic in a popular form, its spiritualistic point d'honneur, its enthusiasm, its moral sanction, its solemn complement, its universal source of consolaton and justification. It is the fantastic realization of the human essence because the human essence has no true reality. The struggle against religion is therefore indirectly a fight against the world of which religion is the spiritual aroma.

Religious distress is at the same time at the expression of real distress and also the protest against real distress. Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, just as it is spirit of spiritless conditions. It is the opium of the people.

To abolish religion as the illusory happiness of the people is to demand their real happiness. The demand to give up illusions about the

existing state of affairs is the demand to give up a state of affairs which need illusions. The criticism of religion is therefore in embryo the criticism of the vale of tears, the halo of which is religion.(১১)

রাষ্ট্রীয় জবরদস্তির মাধ্যমে ধর্ম বিলোপের প্রবক্তা বর্তমান কালে আর প্রায় নেই বললেই চলে। কিন্তু সমাজ ব্যবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন না করে শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রসারের মাধ্যমে ক্রমশ ধর্ম বিলোপের যে কার্যক্রম অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় জ্ঞানবাদীরা প্রস্তাব করেছিলেন, সে কার্যক্রমের প্রবক্তা মার্কসের পরবর্তীকালে দুর্লভ নয়। এ সম্বন্ধে ফ্রয়েড মনে করে করতেন যে মানব শিশুকে আশৈশব ধর্মীয় কুশিক্ষা না দিয়ে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দিলে এ পদ্ধতিতে ক্রমশ ধর্মের বিলোপ অসম্ভব নয় (১২)। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ফ্রয়েড পাশ্চাত্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং ধনতন্ত্রের সমর্থক ও মার্কসবাদ বিরোধী ছিলেন। বারট্রান্ড রাসেল এক ধরনের গণতান্ত্রিক সমাজবাদের প্রতি কিছুটা সহানুভূতিশীল থাকলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং তার সংগে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের উল্লখযোগ্য বিরোধিতা করেন নি। তিনিও বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে ক্রমশ ধর্মের বিলুপ্তি সম্বন্ধে আশাবাদী ছিলেন (১৩)। মার্কসবাদের সামগ্রিক পর্যালোচনা, মার্কসবাদের সংগে ফ্রয়েডীয় দর্শন অথবা রাসেলের মতামতের তুলনা, অথবা প্রাক্তন কিংবা বর্তমান সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে মার্কসবাদ সঠিকভাবে প্রযুক্ত হয়েছে কি না, সে সব বিষয় এই প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তুর পরিধির বাইরে। কিন্তু মানব সমাজের আর্থিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কাঠামোর পুনর্বিন্যাস না করে ধর্মবিশ্বাসের বিলোপ সাধন সম্ভব নয়, এই মার্কসবাদী বক্তব্যকে আমরা বিজ্ঞানসম্মত বলে মনে করি।

ধর্মের প্রতি, এবং ধর্ম দ্বারা ধারণ করা সমাজ ব্যবস্থার প্রতি শুধুমাত্র নেতিবাচক দৃষ্টিভংগী অবলম্বন করলেই ভবিষ্যতের বাঞ্ছিত মানব সভ্যতার ছবি স্পষ্ট হয় না। প্রধানত জাগতিক অনিরাপত্তা বোধ এবং ইচ্ছাপুরনের তাগিদ থেকেই ব্যক্তিমানুষ ধর্মবিশ্বাসের প্রয়োজন অনুভব করে। অবশ্য শাষক শ্রেনী জনসাধারণের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক-সাংগঠনিক ধর্মের মাধ্যমে নিজেদের শোষনশাষন চিরায়ত করার চেষ্টা করে। কিন্তু বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তিজীবনে ধর্মের প্রয়োজন না থাকলে শাষক শ্রেনীরা এভাবে ধর্মকে ব্যবহার করতে পারতো না। অতএব ব্যক্তিমানুষের জাগতিক জীবন থেকে অনিরাপত্তা দূর করতে না পারলে ধর্মবিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা থেকেই যাবে। অর্থাৎ ধর্মের একটি ইতিবাচক, বিজ্ঞানসম্মত, এবং জনসাধারণের কাছে গ্রহনযোগ্য বিকল্পের মাধ্যমেই সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মের বাঁধন শিথিল করে মানবিক মূল্যবোধের উপরে মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ বিকাশকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। সে বিকল্পের মধ্যে থাকতে হবে এমন সাম্য ও স্বাধীনতাময় অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কাঠামো যা মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্ঠিগত নিরাপত্তা বোধকে ক্রমশ সুনিশ্চিত করতে পারে। আর যেহেতু ইতিহাসে ধর্ম মানুষের সংস্কৃতিকেও প্রভাবিত করেছে, অতএব এমন এক নূতন বিজ্ঞান ভিত্তিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা প্রয়োজন যা ধর্মীয় সংকৃতির বিকল্প হিসেবে মানুষের নান্দনিক প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করতে পারে।

অধিজাগতিক অলীক দর্শন থেকে মানুষের ভ্রান্ত চেতনাকে বস্তুজগত এবং মানব জীবনের দিকে ফিরিয়ে আনা মানুষের ইতিহাসে নাস্তিকতাবাদের অমূল্য অবদান। এ অবদানের বিশেষ প্রয়োজন ছিলো এবং আছে। কারণ এখানেই আছে মহাবিশ্ব এবং মানব সমাজ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক চেতনার জন্মভুমি। ধর্মের কল্পলোক থেকে মর্ত্যলোকে দৃষ্টি ফিরে এলেই মানুষের ইতিহাস চেতনা এবং আত্মশক্তির উন্মেষ ঘটে। কিন্তু শুধুমাত্র নাস্তিকতা পৃথিবী এবং মানব সমাজকে নূতন করে গড়বার পক্ষে যথেষ্ট নয়। ইতিহাস এই সাক্ষ্যই বহন করে। প্রাচীন কাল থেকেই ইতিহাসের বিভিন্ন খন্ডকালে নাস্তিকতাবাদীরা বারে বারে ধর্মের বিরোধিতা করে আসা সত্ত্বেও বর্তমানে পৃথিবীতে ধর্মের শক্তি সর্বব্যপী এবং প্রবল। সাম্প্রতিক কালে,

বিশেষত ষাটের দশক থেকে প্রশ্ন উঠেছে, ধর্মকে সরাসরি বিলোপের চেষ্টা না করে তাকে এমন মানবতামুখী রূপ দেয়া সম্ভব কিনা, যার সাহায্যে সাম্য, স্বাধীনতা ও ন্যায়ের দাবিতে জনসাধারণকে অত্যাচার-অবিচার-শোষনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলনে শামিল করা যাবে, আর এভাবে ধর্মকে ব্যবহার করা যাবে মানব সমাজের ভবিষ্যৎমুখী রূপান্তরের হাতিয়ার রূপে।

---------- ** ----------

**পাদটীকা;-**

১। বাদরায়ণ, ব্রহ্মসূত্র, ১/৩/৩২-৩৩, শাংকরভাষ্য

২। ঐ, ৩/৩/৫৩, শাংকরভাষ্য। মূল সংস্কৃত থেকে লেখকের নিজস্ব অনুবাদ।

৩। Surendranath Das Gupta, A History of Indian Philosophy, Motilal Banarsidas, Delhi, 1975, vol. 3, p. 536

৪। জয়ন্ত ভট্ট, ন্যায়মঞ্জরী (সংস্কৃত), চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, বারাণসী, ১৯৭১, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৩, ৩৯-৪২।

৫। Debiprasad Chattopadhyaya, Lokayata: A study in Ancient Indian Materialism, People's publishing House, New Delhi, 1992, p. 331-32

৬। হরিভদ্রসূরি, ষড়দর্শনসমুচ্চয়ঃ গুণরত্নটীকা তর্করহস্যদীপিকা (সংস্কৃত) সহ, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ১৯০৫, পুনর্মুদ্রণ ১৯৮৬, পৃঃ ৩০৪।

৭। শ্রীহর্ষ, নৈষধীয়চরিতম, ১৭/৪২, ৫৮।

৮। হরিভদ্রসূরি, ষড়দর্শনসমুচ্চয়ঃ, পরমার্হতমণিভদ্রসূরিকৃত লঘুবৃত্তিসমাখ্যায়া ব্যাখ্যায়া সহিতঃ, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, বারাণসী, ১৯৫৭, পৃঃ ৬৫-৬৬। মূল সংস্কৃত থেকে লেখকের নিজস্ব অনুবাদ।

৯। উদধৃতির জন্য দেখুন, Frederick Engels, Anti-Durhing: Herr Eugen Durhing's Revolution in Science, Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1954, pp. 437-38 (মূল রচনা ১৮৭৮)।

১০। ঐ, পৃঃ ৪৩৯-৪০।

১১। Karl Marks, Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Law, introduction (মূল রচনা ১৮৪৪)।

১২। Sigmund freud, The future of an illusion, tr. W.D. Robson-Scott, Doubleday, Garden City, 1964 (First Published 1927).

১৩। Bertrand Russell, Religion And Science, Oxford University Press, London, 1961, reprint 1968 (first published 1935).

**********

(প্রবন্ধটি লেখকের '' **ধর্মের ভবিষ্যৎ** '' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত এবং ঈষৎ সংক্ষেপিত।)

**********

**লেখক পরিচিতি** :- ডঃ জয়ন্তানুজ বন্দোপাধ্যায় প্রথম জীবনে ভারতীয় ফরেন সার্ভিসে কুটনীতিক ছিলেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে (এক বছর), ব্রিটিশ ফরেন অফিস, এবং লন্ডনের ভারতীয় হাইকমিশনে প্রশিক্ষনের পর তিনি ১৯৫৮-১৯৫৯ সনে ঢাকায় তৎকালীন ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনে সেকেন্ড সেক্রেটারি ও হেড অফ চ্যানসারি ছিলেন। ১৯৫৯-৬০ সনে তিনি করাচিতে ভারতীয় হাই কমিশনে সেকেন্ড সেক্রেটারী ছিলেন। ১৯৬০ সালে দিল্লীর বিদেশ মন্ত্রকে থাকা কালে তিনি ফরেন সার্ভিস থেকে পদত্যাগ করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে অধ্যাপক পদে যোগ দেন। ১৯৭০-৭১ সালে তিনি এক বৎসর নিউ ইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনিয়র ফেলো ছিলেন এবং ১৯৭১-৭২ সনে এক বৎসর রাজধানী

ওয়াশিংটনের আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে অধ্যাপক ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগীয় প্রধান, কলা শাখার ডিন, এবং কার্যনির্বাহক উপাচার্য ছিলেন। ১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ষাট বৎসর বয়সে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থাকে অবসর গ্রহন করেন। রাষ্ট্রসংঘ, এবং বিভিন্ন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় ও ইনস্টিটিউটের আমন্ত্রনে তিনি বহুবার আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বক্তৃতা দিয়েছেন এবং সেমিনার, কনফারেন্স প্রভৃতিতে অংশগ্রহন করেছে। তাঁর বহুসংখ্যক গবেষনাপত্র দেশে বিদেশে প্রকাশিত হয়েছে। জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী, এবং শুদ্রমুক্তি, নারীমুক্তি ও আন্তর্জাতিকতার প্রবক্তা হিসেবে ডঃ বন্দোপাধ্যায় সুপরিচিত।

**********

**অনুলিখন : অনন্ত ১৯-০২-০৫**
ananta_atheist@yahoo.com